লেনিন দিবস' বিশেষ সংখ্যা

SOCIALIST UNITY CENTRE OF INDIA
(West Bengal ... Committee)
48, Dharmatala Street, Calcutta-13.

গণদাবী

প্রধান সম্পাদক—সুবোধ ব্যানার্জ্জী এম,এল,এ
সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের বাংলা মুখপত্র

৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম বিশেষ সংখ্যা | বুধবার ২০শে জানুয়ারী ১৯৫৪ | [দুই আনা

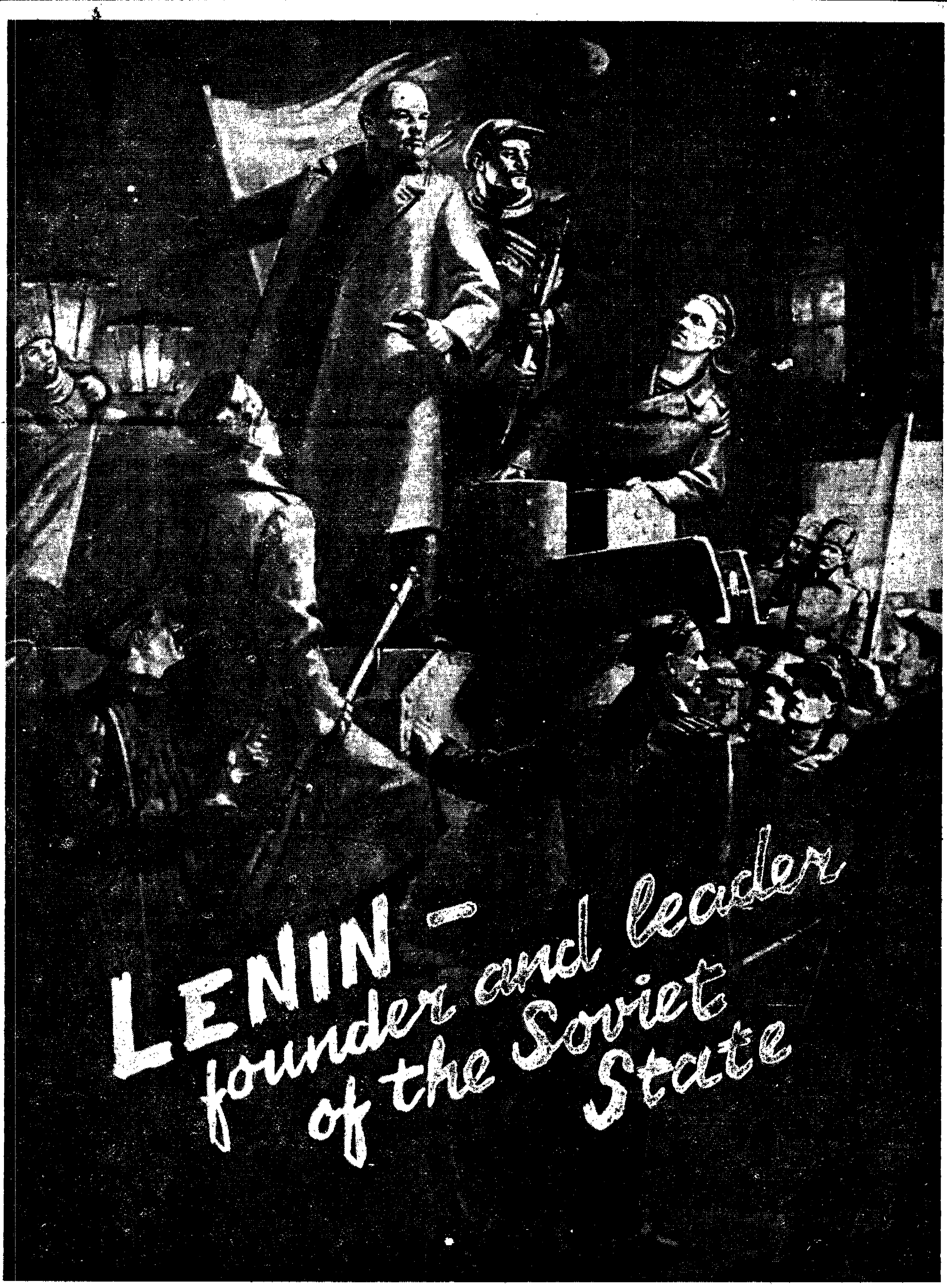

['টাসে'র সৌজন্যে]

লেনিন দিবসের সঙ্কল্প

২১শে জানুয়ারী দুনিয়ার মেহনতী জনসাধারণের প্রিয়তম নেতা, সর্ব্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তিপথ-প্রদর্শক এবং রুশ দেশের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্রষ্টা কমরেড লেনিনের মৃত্যু দিবস। বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিটি দেশের মুক্তিকামী শান্তিকামী জনসাধারণ এই দিনটিকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে, লেনিনবাদের অমূল্য শিক্ষাভাণ্ডার থেকে সম্পদ আহরণ ক'রে নিজেদের চলার পথের প্রতিটি বাধা বিঘ্নকে ধূলিসাৎ করার জন্য কৃতসঙ্কল্প হয়। কমরেড লেনিন রুশ দেশের জনসাধারণের মুক্তিদাতা হিসেবে শুধু রুশ দেশেরই নেতা নন, তিনি দুনিয়ার সর্ব্বহারা শ্রেণীকে বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত করার অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিক্ষক। তাই ভারতের মেহনতি জনতার কাছেও এই দিবসকে উপযুক্ত ভাবে পালন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে প্রচুর। কমরেড লেনিন তাঁর সারা জীবন দিয়ে একটি জিনিষ প্রমাণ করে গেছেন যে বিপ্লবের মারফৎ শোষণ হীন শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থা তথা সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার ভেতরই নিহিত আছে প্রকৃত মুক্তির সন্ধান।

লেনিনের দৃষ্টিতে পার্টির মুল নীতি

কমরেড লেনিন বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল ও সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার সময় এই শিক্ষাই দিয়েছেন যে শ্রমিক শ্রেণীর দল কখনই মূল নীতি বিসর্জন দিতে পারে না। দলের মুল নীতি বিসর্জন দেওয়া আত্মহত্যারই নামান্তর। ভারতের মাটিতে সেই শিক্ষাকে কার্য্যকরী করার দায়িত্ব আমাদেরই গ্রহণ করতে হবে। ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি যখন মুলনীতি বিসর্জনের এক বিরাট ইতিহাস রচনা করেছে, তখন মত বাধা বিঘ্নকে উপেক্ষা করেও সঠিক নীতির বিরুদ্ধে প্রতিটি আন্দোলনকে পরিচালনা করতে হবে। আর সেই উদ্দেশ্যকে রূপায়িত করার জন্য চাই দলের ঐক্যকে বজায় রাখা—সমস্ত প্রকার বিভেদনীতিকে যোগ্য নেতৃত্বাধীনে থেকে দূরীভূত করা। কমরেড লেনিনের এ শিক্ষা আমরা এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলবো না।

পার্লামেণ্টারী আন্দোলন সম্পর্কে লেনিন

কমরেড লেনিন সারা দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর দলের কাছে একটি অমূল্য শিক্ষা রেখে গেছেন যে বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনা করার সময়ে দু'ধরণের বিচ্যুতির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। উগ্র বামপন্থী নীতির বিরুদ্ধে তিনি যেমন তীব্র সমালোচনা করেছেন তেমনি সংস্কারবাদী মোহ থেকেও দূরে থাকতে প্রতি মুহূর্ত্তে নির্দ্দেশ দিয়েছেন। পার্লামেণ্টারী আন্দোলনকে সর্ব্ব-অবস্থাতেই বর্জন করতে তিনি বলেন নি; কিন্তু অবস্থা বিশেষে সেই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেও তার বৈপ্লবিক ব্যবহারকেই সমর্থন করেছেন—এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিপ্লবের উদ্দেশ্য থেকে ভ্রষ্ট না হবার নির্দ্দেশ দিয়েছেন। আমরা এই দিনে কমরেড লেনিনের এই অমূল্য শিক্ষাকে বর্তমানের নিয়মতান্ত্রিক আবহাওয়াতেও উঁচু করে রাখার শপথ গ্রহণ করছি।

সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে কমরেড লেনিন

সাম্রাজ্যবাদই পুঁজিবাদের সর্ব্বোচ্চ স্তর। এযুগে পুঁজিবাদের উন্নতির কোনই সম্ভাবনা নেই—তাই তাকে "ক্ষয়িষ্ণু ধনতন্ত্রবাদ" হিসেবেই তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। কমরেড লেনিন বারবার শোষিত জনতার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন যে সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসের পথেই সারা দুনিয়ার মেহনতী জনতার মুক্তি আসতে পারে। সে শিক্ষাকে স্মরণ করেই বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে পার্টি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যুদ্ধ-বিরোধী শান্তি আন্দোলনে সামিল হয়েছে। এই দিবসে তাই বিশ্বশান্তি আন্দোলনকে জোরদার ও তীব্রতর করার দৃঢ় সঙ্কল্প ঘোষণা করছি।

আদর্শগত সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা ও কমরেড লেনিন

বিপ্লবী আন্দোলনের মূল শক্তি হচ্ছে তার বিপ্লবী আদর্শ। বিপ্লবী আদর্শ-বিহীন দল আর যাই হোক শ্রমিক শ্রেণীর দল নয়—এ শিক্ষা আমরা কমরেড্ লেনিনেন কাছ থেকেই পাই। দল হিসেবে সোসালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার তার জন্মের পর থেকেই এই আদর্শগত সংগ্রামের শক্তিতেই নিজের সাংগঠনিক তথা বিপ্লবের প্রস্তুতির পথকে প্রশস্ত করছে। ভারতের মাটিতে গান্ধীবাদী দর্শনের ভাববাদী রূপকে বৈজ্ঞানিক মাপকাঠিতে বিশ্লেষণ করেছি আমরাই সর্ব্বপ্রথম; এ ছাড়া সোস্যাল ডেমোক্র্যাট-বাদ (Social Democratism)-এর বিরুদ্ধে, সাম্যবাদী আন্দোলনের নামে বারবার বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি এবং সর্ব্বপ্রকার সুবিধাবাদী নীতির বিরুদ্ধে আমাদের বৈজ্ঞানিক সমালোচনা শ্রমিক শ্রেণীকে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। এই গুরুতর দায়িত্বকে ভবিষ্যতেও বহন করার শপথ গ্রহণ করছি।

শ্রমিক শ্রেণীর দল সম্পর্কে লেনিনের শিক্ষা

শ্রমিক শ্রেণীর সাত্যকারের দল ব্যতীত বিপ্লব সম্ভব নয়। আর এই দলকে হতে হবে জনতার অগ্রগামী বাহিনী। জনতার ওপরে দলের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা না হলে, ব্যাপক জনসাধারণের সক্রিয় সমর্থন ছাড়া, শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে লক্ষ্যে পৌছুনো সম্ভব নয়। বর্তমানের যুগসন্ধিক্ষণে কমরেড লেনিনের এই শিক্ষাকে বিশেস করে স্মরণ করতে হবে। ভারতবর্ষের মাটিতে সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের নির্ভুল মতবাদিক বিশ্লেষণকে কার্য্যে পরিণত করার জন্য দলকে শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত ও অন্যান্য সমগ্র মেহনতী জনতার ভেতরে ছড়িয়ে দিতে হবে। লেনিন দিবসে এটাই হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

অমর কমরেড লেনিন—অমর লেনিনবাদের শিক্ষা।

'গণতান্ত্রিক সরকার'—

আমাদের দেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে কোন কোন রাজনৈতিক মহল থেকে বেশ কিছুদিন ধরে যুক্ত 'গণতান্ত্রিক সরকার' গঠনের এক শ্লোগান বা ধূয়া তোলা হয়েছে। এই প্রশ্নটি আজ নতুন করে দেখা দেয়নি একথা সত্য—বিগত সাধারণ নির্ব্বাচনের আগে থেকেই এ প্রসঙ্গ জনসাধারণের সামনে উত্থাপিত হয়েছে। কিন্তু তবুও বর্ত্তমান অবস্থায় এই প্রশ্নটির যথাযথ আলোচনা করার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

কংগ্রেসী সরকারের পরিবর্ত্তে সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তি সমূহের এক ঐক্যবদ্ধ সরকার গঠন করার যে প্রশ্ন আজ উপস্থিত হয়েছে তাকে শুধুমাত্র জনপ্রিয়তা বা জনসমর্থনের মাপকাঠিকে বিচার করলে কিংবা সেইভাবে তার যৌক্তিকতা নির্দ্ধারণ করলে ঠকতে হবে নিঃসন্দেহে। প্রকৃতপক্ষে এই প্রশ্নটিকে বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে মার্কসবাদী লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

দীর্ঘদিনের বিদেশী শোষণের নিষ্পেষণে যখন জনজীবন দুর্ব্বিষহ হয়ে উঠছিল তখন সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ ধ্বনিত হয়েছিল জাতীয় কংগ্রেসের ভেতর দিয়ে সন্দেহ নেই। ইংরেজ বিরোধীতার সস্তা সুযোগ নিয়ে তখন কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ জনসাধারণের সমর্থনকে কাজে লাগিয়েছে যথেষ্ট। তারা জনতাকে প্রতি মুহুর্ত্তে এই আশ্বাসই দিয়েছে যে কংগ্রেস ক্ষমতা পেলে জনসাধারণের দুঃখ দুর্দ্দশা কিছুই থাকবেনা—শুধু প্রয়োজন ইংরেজ শাসনকে ধূলিসাৎ করা। এই প্রতিশ্রুতির পেছনে লাখ লাখ জনতার জমায়েৎ, আত্মত্যাগ ও কষ্ট সহ্য করার ফলেই কংগ্রেস আজ গদীতে আসীন।

আজ সেই কংগ্রেসী সরকারই জনসাধারণের ঘাড়ের ওপর একের পর এক শোষণের বোঝা চাপিয়ে চলেছে। সুতরাং একদিন যে প্রতিশ্রুতির জনতার মনকে আশান্বিত করে তুলেছিল, আজকে তারা বুঝতে পারছে যে সেই প্রতিশ্রুতির ওপর অন্ধভাবে আস্থা স্থাপন করার ফলেই তাদের এই দুর্ভোগ। অর্থাৎ সুস্পষ্ট রাজনৈতিক ধারনার অভাবই জনতাকে সঠিক পথে চলতে বাধা দিয়েছে। সুতরাং আজকেও এই নতুন প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে তাদের রাজনৈতিক সচেতনতাকে শানিয়ে নিতে হবে।

যে কোন রাজনৈতিকজ্ঞান সম্পন্ন লোকই একথা আজ বুঝতে পারেন যে ক্ষমতা হস্তান্তরের ভেতর দিয়ে দেশের মূল অর্থনৈতিক কাঠামোর কোনই পরিবর্তন সাধিত হয় নি (যদিও রাজনৈতিক শক্তি বিন্যাসের ক্ষেত্রে একটা পরিবর্ত্তন ঘটেছে)। যে শোষণমূলক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ইংরেজ আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই ব্যবস্থা, সেই আইন-কানুন, সেই একই আমলাতান্ত্রিক শাসনবিভাগ এখনও বিরাজ করছে। শুধু পূর্ব্বে যেক্ষেত্রে এই সমস্ত কার্য্যকলাপের পরিচালনা হ'ত বিদেশী শক্তির অঙ্গুলী হেলনে. আজ সেখানে সেই পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে কংগ্রেসী সরকার। আর এই মৌলিক পরিবর্ত্তনের অভাবই বর্ত্তমানে জনসাধারণের দুঃখ দুর্দ্দশার মুল কারণ। মনে রাখা দরকার যে যতদিন না এই শোষণমূলক পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থার ধ্বংস সাধন হচ্ছে ততদিন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মূলগত পরিবর্ত্তন সাধন করা সম্ভব নয়। তার কারণ হচ্ছে এই যে, এমন কি নির্ব্বাচনের মাধ্যমে যদি বামপন্থী দলের প্রতিনিধিরা আইন সভা দখলও করতে পারে তাহলেও তার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। আইন সভার অধিকার শুধুমাত্র আইন প্রণয়নে (legislative power) কিন্তু সেই আইন কার্য্যকরী করার ক্ষেত্রে (executive power) নয়। জনসাধারণ আইন মেনে চলতে বাধ্য হয় ততক্ষণ যতক্ষণ তার পেছনে পুলিশী শক্তি থাকে। আইন না মেনে চললে পুলিশ গ্রেপ্তার করবে এবং শাস্তি দেবে এ অবস্থা যদি না হোত, তাহলে সমস্ত আইন কাগজী আইন হিসেবেই থাকতো—তার কোন কার্য্যকরীতাই থাকতো না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে যুক্তি তর্কের খাতিরে যদিও ধরা যায় যে জনসাধারণের সত্যিকারের প্রতিনিধিদের পক্ষে আইন সভা দখল করা সম্ভব কিন্তু তবুও মনে রাখা দরকার যে এই পুলিশ বিভাগ ইত্যাদিতে নির্বাচন হয়না—এগুলো চিরস্থায়ী বিভাগ বা permanent post। আর এই বিভাগের পেছনেই প্রতি বৎসর সবচেয়ে বেশী অর্থ, শক্তি এবং সামর্থ খরচ করা হচ্ছে নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য নিয়ে। অর্থাৎ যদি কোন সময় আইন সভা শাসকগোষ্ঠীর হাতছাড়াও হয়ে যায় এবং সেই আইনসভা জনস্বার্থে তথা শাসকগোষ্ঠী বা সেই শ্রেণীর স্বার্থবিরোধী

—'লেনিনবাদী' কম্যুনিষ্ঠ পার্টির নবতম অবদান

কোন আইন প্রণয়ন করে তাহলে সেই আইনের কোনই মূল্য থাকবেনা যদি পুলিশী শক্তির তার পেছনে সমর্থন না থাকে। কিন্তু এটা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট যে, শোষক শ্রেণী এত চেষ্টা এবং অর্থ সাহায্যে যে বিভাগ গড়ে তুলেছে তার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে তার শ্রেণী-স্বার্থকে রক্ষা করা—তাকে এককথায় তারা পরিত্যাগ করতে পারেনা। শুধু তাই নয়; মনে রাখা দরকার যে নির্বাচন প্রচলিত সরকারের ইচ্ছা, খেয়ালখুসী মতই সাধিত হয়। তারা জনসাধারণকে নির্বাচনে অংশ গ্রহন করতে আহ্বান করে তখনই যখন তারা বোঝে যে এর দ্বারা তাদের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। অর্থাৎ তারা নিজেরা নিজেদের কবর খুঁড়বে না এটা মনে করা নিশ্চয়ই বিন্দুমাত্র ভুল হবে না। শোষকগোষ্ঠী পরিষ্কার জানে যে আইনসভা তার হাত থেকে চলে গেলেও যেহেতু তার মূল ভরসাস্থল মিলিটারী ও পুলিশ শক্তি এখনও বেশ বহাল তবিয়তে আছে, প্রয়োজন হলে সে ঐ আইন সভাকে এক নির্দ্দেশে পঙ্গু করে দিতে পারে। অবশ্য একথা তখনই প্রযোজ্য যখন বাইরে জনস্বার্থ রক্ষা করার মত কোন গণফৌজ থাকে না। সুতরাং পুলিশ বা সামরিক শক্তি এই নূতন আইন সভার বিরুদ্ধাচরণ অবশ্যই করবে—এবং প্রয়োজন হলে আইন সভার সদস্যদের গ্রেপ্তার ইত্যাদিও করতে পারে। সেই মুহূর্ত্তে এই পুলিশ এবং শক্তিকে মোকাবিলা করার মত যদি গণফৌজ বাইরে প্রস্তুত না থাকে, জনসাধারণকে এই শক্তির সঙ্গে বিপ্লবী কায়দায় লড়াই করবার মত উপযুক্তরূপে শিক্ষিত করা না যায়, তাহলে ঐ আইন সভা দখল করার কোনই মূল্য থাকেনা। আর যদি বাইরের অবস্থা অনুকূল হয় তাহলে সেই অবস্থাতেই সামরিক শক্তির সাথে গণফৌজের বা সংঘবদ্ধ বিপ্লবী জনশক্তির সংঘর্ষ হবে অবশ্যম্ভাবী এবং তারই নাম হচ্ছে বিপ্লব। অর্থাৎ যে অবস্থাতেই হোক প্রচলিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনতার সশস্ত্র লড়াইকে বর্জ্জন করে আর যাই হোক জনতার মৌলিক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় সুতরাং পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে বর্তমানের শোষণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থাতে এমনকি জনসাধারণের সত্যিকারের প্রতিনিধিরাও আইন সভা দখল করলে জনস্বার্থে কিছু কিছু সংস্কারমূলক কাজ ব্যতীত কোন প্রকার মৌলিক সমস্যার সমাধান করতে পারে না। এখানে সমস্যা সমাধানে একাগ্রতার কোন প্রশ্নই অসে না—যে-হেতু একাগ্রতার চাইতে জরুরী প্রশ্ন হচ্ছে প্রচলিত আইন-কানুন রাষ্ট্র-ব্যবস্থা। এর ধ্বংস সাধনের ফলেই শোষণকে নিঃশেষ করা যায়, এর প্রতিষ্ঠাকে স্বীকার করে নয়।

এই কারণেই বিপ্লব অপরিহার্য্য এবং বিপ্লবের প্রশ্ন বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর দলের কাছে এত জরুরী। কোন দল যদি সত্যি সত্যি শ্রমিকশ্রেণীর দল হয় তাহলে সে দল আর যাই করুক কোন সময়েই, কোন যুক্তি তর্কের অবতারণা করেই অন্ততঃ বিপ্লব বিরোধীতা করতে পারে না। এটা সেই দলের সমস্ত রাজনীতির মূল প্রশ্ন। তার প্রতিটি কাজ, প্রতিটি পদক্ষেপ নির্দ্ধারিত হয় বিপ্লবী স্বার্থের মাপকাঠিতে। তা না হলে তার অস্তিত্বেরই কোন প্রয়োজন থাকেনা। এই যুক্তি শুনে হয়তো কেউ কেউ বলবেন যে বিপ্লবই যদি শ্রমিকশ্রেণীর দলের মূল উদ্দেশ্য হয় তাহলে সেই দলের নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণ করাটাই ভুল। একটু চিন্তা করলেই এই যুক্তির অসারতা ধরা পড়বে। বিপ্লব মূল উদ্দেশ্য জেনেও বিপ্লবী দল নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে সেই সময় যখন সে দেখতে পায় যে আজই দেশের সমস্ত অবস্থা বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত নয়। এবং যখন সে দেখতে পায় যে, জনসাধারণের এখনও আইনসভার প্রতি, নিয়মতান্ত্রিক (constitutional) আন্দোলনের প্রতি যথেষ্ট মোহ বর্ত্তমান। সে অব-অবস্থায় ঐ দল যদি নির্বাচন বর্জনও করে, তাহলেও জনসাধারণ নির্ব্বাচনকে গ্রহণ করবে। তখন জনসাধারণের থেকে দূরে সরে নিশ্চয়ই জনসাধারণকে সঠিক পথে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। বরঞ্চ এটাই হবে সঠিক নীতি যে সেই দল নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে এই উদ্দেশ্য নিয়ে এবং এমন কায়দায় যাতে জনসাধারণের নিয়মতান্ত্রিক পন্থার প্রতি মোহ দ্রুত কাটানো সম্ভব হয়। নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহন করে জনতাকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করবে—তার মূল রাজনৈতিক শিক্ষা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করবে এবং একটা কথাই বোঝাবে যে শ্রমিক শ্রেণীর দল ভোটের মারফৎ ক্ষমতা পেলেও জনতার মূল সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। কিন্তু তবুও সেই দলের প্রতিনিধিকে এই জন্যই জনতার জয়যুক্ত করা প্রয়োজন যেহেতু সেই প্রতিনিধি শোষকগোষ্ঠির প্রতিটি জনস্বার্থ বিরোধী কার্য্যকলাপের বিরোধিতা করবে। অর্থাৎ শোষক-গোষ্ঠির নিরঙ্কুশ শোষণকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে শ্রমিক শ্রেণীর দলের প্রতিনিধির আইনসভায় যাওয়া অত্যন্ত জরুরী। এবং সেই প্রতিনিধিরও কাজ হবে আইনসভার ভেতর দিয়ে জনস্বার্থ বিরোধী আইনকে বাধা দেওয়া সম্ভব হলে আইন সভার গণ্ডীতে যতটা সংস্কার বা concession আদায় করা যায় সেদিকে দৃষ্টি রাখা এবং এই আইন সভার সীমাবদ্ধতা এর অপদার্থতাকে পরিষ্কার করে খুলে ধরে এর প্রতি জনতার মোহকে ক্রমাগত কমাতে সাহায্য করা।

সুতরাং এটা খুব পরিষ্কার যে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা কোন বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর দলের পক্ষে ততক্ষন সমর্থনযোগ্য যখন সেটা পরোক্ষভাবে বিপ্লবের প্রস্তুতিকে সাহায্য করে—জনতাকে মোহমুক্ত করে। দল এই পার্লামেণ্টারী আন্দোলনে অংশ গ্রহন করার সময় এই উদ্দেশ্য থেকে ভ্রষ্ট হোল কিনা সেটা বোঝা যাবে তার প্রচার এবং এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার নির্ভুল কায়দার ওপর। যদি এটা দেখা যায় যে দল শ্রমিক-শ্রেণীর দল হিসেবে নিজেকে দাবী করেও একমাত্র নির্বাচনের "সীটে"র স্বার্থে বা যে কোন ছোটখাট ব্যাপারে বৃহত্তর গণআন্দোলনের সম্ভাবনাকে ধুলিসাৎ করে তাহলে সেই দলের সংস্কারবাদী (reformsit) চরিত্রই প্রকাশ পাবে।

এখানে ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির নীতির কথাই বলা হচ্ছে। এই পার্টি সাধারণ নির্বাচন থেকে শুরু করে প্রতিটি উপনির্বাচনে যেভাবে অংশগ্রহন করেছে তাতে এটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। "শুধু কংগ্রেসকে হারাতে হবে" এই Slogan মেটেই যথেষ্ট 'নয়' বরং কংগ্রেসকে হারাতে হবে এই অর্থে যেহেতু কংগ্রেস দল-হিসেবে ভারতবর্ষে পুঁজিবাদকে টিঁকিয়ে রেখেছে। সুতরাং যদি কংগ্রেসের পরিবর্ত্তে অন্য কোন দল পুঁজিবাদকেই টিঁকিয়ে রাখার উদ্দেশ্য নিয়েই বিচরণ করে তাহলে সে দল কংগ্রেস বিরোধীতা করলেও তার চরিত্র সঠিক উদ্‌ঘাটন হওয়া প্রয়োজন। নির্বাচনে ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টিই জনসাধারণের সামনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে পাল্টা গণতান্ত্রিক ঐক্যের সরকার প্রতিষ্ঠার প্রচার চালাচ্ছে। এমনকি কম্যুনিষ্ট পার্টি তার ৩য় পার্টি কংগ্রেসেও সেই মর্ম্মে প্রস্তাব গ্রহন করেছে।

অনেকে হয়তো বলতে পারেন, যে কম্যুনিষ্ট পার্টিও তো বিপ্লবের কথা বলে—তারাও তো বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে না; সুতরাং গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের প্রস্তাব করলেও আসলে এর ভেতর দিয়ে বিপ্লবের কার্য্যই সমাধান করতে চায়—তাহলে তার একটি মাত্র জবাব হচ্ছে যে বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তাকে মুখে স্বীকার করা এবং কার্য্যে পরিণত করার চেষ্টা করা এক কথা নয়। বিপ্লবের মারফৎ যে জনসাধারণ ক্ষমতা দখল করবে সেই জনসাধারণই আজ বিভিন্ন বিপ্লবী সংগঠনের অধীনে সংঘবদ্ধ নয়। শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র প্রতিটি আন্দোলনের ক্ষেত্রেই দেখা যাবে প্রচুর বিচ্ছিন্নতা এবং বিভেদ। বিপ্লবের উদ্দেশ্যে প্রতিটী আন্দোলন পরিচালনা করতে হ'লে জনতার ক্ষমতা দখলের জন্য নিজস্ব সংগঠন গড়ার প্রশ্ন অত্যন্ত জরুরী। বিপ্লবী দলের কাছে নির্ব্বাচন জনতাকে সংগঠিত করার ও সুযোগ দেয় অনেক। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ঠিক যে কায়দায় বৃটিশ আমলে কংগ্রেস নির্ব্বাচনী লড়াইয়ের অংশ গ্রহন করেছে—জনতাকে সংঘবদ্ধ না করে ওপর থেকে কোন এক বিশেষ নেতার জনপ্রিয়তা ইত্যাদির সুযোগ গ্রহন করে জয়যুক্ত হবার চেষ্টা করেছে আজকে কম্যুনিষ্ট পার্টিও ঠিক একই বুর্জোয়া কায়দায় নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহন করছে। নির্ব্বাচনে প্রার্থী যে নীতি সমর্থন করে তার চাইতে যখন প্রার্থীর ব্যক্তিগত পরিচয় অর্থাৎ তিনি কত বড় ব্যারিষ্টার বা কত বড় নামজাদা নেতা সেটাই যখন প্রাধান্য লাভ করে তখন এই সমস্ত ত্রুটি থাকবে তাতে আর আশ্চর্য্য হবার কি ? জনতার মুক্তি আনতে হলে, জনতাকে ক্ষমতা দখল করতে হলে তার সচেতন সংঘবদ্ধতা আনতে হবে। অথচ দেখা যাচ্ছে যে এই সমস্ত জরুরী প্রশ্নের প্রতি বিন্দুমাত্র দৃষ্টিপাত না করে কম্যুনিষ্ট পার্টিও সেই পুরানো কংগ্রেসী কায়দায় লড়াই করছে। অর্থাৎ "বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করি"—একথা বলেও যদি

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)

বিশ্বরাজনীতির পটভূমি

বর্তমান পৃথিবীর আন্তর্জাতিক সমস্যার জটিলতাকে এক কথায় প্রকাশ করা যায় না। কারণ বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী স্বার্থের সংঘাত, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধরণের আভ্যন্তরীন অবস্থা বৈদেশিক ও জাতীয় নীতির সংঘর্ষের ফলে এই জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সমস্যার রূপ যতই দুর্বোধ্য হোক না কেন, দুনিয়ার অর্ধেক অংশের সাধারণ মানুষের ভাগ্যে আজও যে হতাশা ও দুর্দ্দশার বোঝা চেপে রয়েছে তাকে সরিয়ে ফেলে সমাজ ও সভ্যতাকে বাধাহীন উন্নতি ও শান্তির পথে পরিচালিত করতে হ'লে এই সমস্যার সমাধানের রাস্তাকে উন্মুক্ত করতেই হ'বে। যাঁরা কমিউনিষ্ট, তাঁদেরই দায়িত্ব হ'ল সমাজের ঘটনাস্রোতকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভঙ্গীতে বিচার করা এবং তার সঠিক পদ্ধতি ও সারমর্ম টুকুকে জেনে নিয়ে জনসাধারণের দৃষ্টির সামনে সমস্যার স্বরূপকে বিশ্লেষন করা।

বাস্তব ঘটনা ও তথ্যের প্রতি দৃষ্টি-পাত করলে সহজেই বোঝা যায় যে বর্ত্তমান পৃথিবী দুই শিবিরে বিভক্ত। এক শিবিরের সংগে অপর শিবিরের সম্পর্ক মূলতঃ বিরোধ বা শত্রুতার সম্পর্ক। যদিও আজ কার্য্যক্ষেত্রে অনেক বিষয়ে চেষ্টা ক'রে পরস্পরের মধ্যে মতৈক্য স্থাপন করা সম্ভবপর হচ্ছে যার ফলে শান্তির স্থায়িত্বের সম্ভবনা কোন কোন ক্ষেত্রে জোরদার হচ্ছে, কিন্তু তবু এই দুই শিবিরের মূলগতঃ পার্থক্য ও বিরোধ ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে। এদের মধ্যে প্রথম শিবিরের নেতা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আর তার সহযোগী, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি পুঁজিবাদী দেশ এবং তাদের সংগে সম্পর্কিত সমস্ত পুঁজিবাদী, সামন্ততান্ত্রিক ঔপনিবেশিক ও আধা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র। অপর শিবিরের নেতা সমাজবাদী সোভিয়েট ইউনিয়ন, যার সহযোগী বন্ধু হ'ল নতুন চীনের গণতান্ত্রিক সরকার, পূর্ব ইউরোপ ও জার্মাণী এবং দুনিয়ার অন্যান্য প্রত্যেকটী দেশের শোষিত মুক্তকামী জনসাধারণ। প্রথম শিবিরের উদ্দেশ্য—এক চেটিয়া পুঁজিবাদী শোষণ ব্যবস্থাকে রক্ষণের জন্যে প্রত্যেকটী দেশের শ্রামিক কৃষক ও মেহনতী জনসাধারণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরাধীনতাকে কায়েম রাখা; ঔপনিবেশিক শোষন ব্যবস্থাকে অক্ষুন্ন রাখার জন্য দুনিয়ার সর্বত্র সংগ্রামী জনসাধারণকে নির্য্যাতন ক'রে মুক্তি আন্দোলন দমন করা এবং সারা দুনিয়া জুড়ে তাদের একচেটিয়া ব্যবসা ও সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্ব কায়েম রাখায় বিঘ্নকারী সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীনকে ধ্বংস করার জন্য নতুন নতুন মারনাস্ত্রের উৎপাদন করা এবং এইভাবে সারা পৃথিবীকে আর এক মহাযুদ্ধের পথে ঠেলে দেওয়া। এই উদ্দেশ্যে তারা আজ একদিকে পৃথিবীর প্রত্যেকটী ধনতান্ত্রিক দেশের সংগে মিতালী করবার চেষ্টা করেছে অপর দিকে সুযোগ পেলেই অপরাপর দুর্ব্বল ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে হটিয়ে তাদের জায়গা জুড়ে বসতে চাইছে। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক ও আধা ঔপনিবেশিক দেশের প্রতি আমেরিকার আচরণের যেমন একটা মূলগতঃ সাদৃশ্য দেখা যায় তেমনি আবার গরমিলেরও অভাব নেই। আবার বিভিন্ন দেশের পুঁজিপতিরাও নিজ নিজ স্বার্থের দিক থেকে বিচার ক'রে আমেরিকার এই যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকাকে বিভিন্ন ভাবে দেখছে, কাজেই তাদের পরস্পরের মধ্যেও মনোভাবের যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু সব রকম যোগ বিয়োগ করার পরেও যা দাঁড়ায় তা হ'ল দুনিয়ার সমস্ত অগ্রসর ও অনগ্রসর পুঁজিবাদী ও আধা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রই আজ স্বেচ্ছায় মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের সংগে আপোষরফা ক'রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতির পথে চলেছে। অপর দিকে দ্বিতীয় শিবিরের নেতা সোভিয়েট ও তার সহযোগী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি আজ প্রীতি বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক সহযোগীতার ভিত্তিতে নিজেরা অবাধ উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে এবং সেই সঙ্গে দুনিয়ার সমস্ত প্রগতিশীল ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে একত্র ক'রে যুদ্ধ বিরোধী শান্তি আন্দোলনকে ব্যাপক ও প্রবলতর ক'রে তোলবার চেষ্টা করছে। এই উদ্দেশ্যে তারা ডাক দিচ্ছে 'শান্তি কংগ্রেস' ও শান্তি আন্দোলনে যোগদান করতে; এই উদ্দেশ্যে তারা চেষ্টা করছে প্রত্যেকটী পুঁজিবাদী দেশের সংগে খোলাখুলি বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন ক'রে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা হ্রাস করতে; সমস্ত প্রকার মারণাস্ত্র ও সামরিক চুক্তির বিরুদ্ধে তাদের প্রস্তাব এবং একজাতি কর্ত্তৃক অপর জাতির স্বাধীনতার হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ এই কারণেই। শান্তির জন্য তাদের মনোভাব সক্রিয়, প্রচেষ্টা আন্তরিক এবং পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক।

এই দুই শিবিরে বিভক্ত বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পৃথিবীর ছবিকে সামনে রেখে আজ প্রতিটী পুঁজবাদী সামন্ত তান্ত্রিক, ঔপনিবেশিক বা আধা ঔপানবেশিক দেশের আভ্যন্তরীন পরিস্থিতি, জাতীয় সরকারের শ্রেণী চরিত্র ও বৈশিষ্টা, জাতীয় ও বৈদেশিক নীতি এবং সর্ব্বোপরি সে দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি নির্ধারন করতে হ'বে। পুঁজিবাদের বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে আজ এমন এক যুগ এসেছে যখন কোন ধনতান্ত্রিক দেশেই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও সমস্যার উর্দ্ধে থেকে স্ব ইচ্ছানুযায়ী ও নতুন কায়দায় রাষ্ট্র পরিচালনা ক'রে স্বতন্ত্র ভাবে বেঁচে থাকতে পারে না। তাই লেনিনের ভাষায় "পুঁজিবাদ আজ বিশ্ব পুঁজিবাদে রূপান্তরিত হয়েছে।" তার পুঁজি ও শোষণের শৃঙ্খল সারা পৃথিবীকে বেষ্টন করে রয়েছে কেবলমাত্র সোভিয়েট ইউনিয়ন চীন প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক ও নয়া গণতান্ত্রিক দেশগুলি ছাড়া। তাই প্রত্যেকটী পুঁজিবাদী দেশের সরকারই আজ আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্রের সংগে ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান কংগ্রেস সরকার এই সম্পর্ককে খুব সুদৃঢ়ভাবেই রক্ষা করছে এবং সেই সম্পর্কের আসল রূপ প্রকাশিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার ভূমিকা ও বৈদেশিক নীতি মারফৎ। কাজেই আমাদের দেশের ভবিষ্যত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বার্থে ও বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমস্ত ক্ষেত্রে অগ্রসর হ'তে গেলে নেহরু সরকারের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বর্ত্তমান ভূমিকাকে সঠিকভাবে বিচার করতে হবে।

বাস্তবিকই দেখা যায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নেহরু সরকারের সুনামের অভাব নেই। মার্কিন সমর বিভাগের কর্তারা থেকে আরম্ভ ক'রে সোভিয়েট শান্তি কমিশনের নেতারা সকলেই নেহরুর আন্তর্জাতিক ভূমিকা বৈদেশিক নীতি ও শান্তি নীতির জন্য যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন এবং আজও করছেন। নেহরু সরকারের কাছে নিক্সন সাহেব এবং চীনের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বাহ্যতঃ একই ভাবে সমাদর লাভ করে। নেহরু নিজে কমনওয়েলথ রাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে ব্রিটেনের মহারাণীর অভিষেক উৎসব পালন ক'রে এলেও কন্যা ইন্দিরা সোভিয়েট ভ্রমনের পর শতমুখে সে দেশের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে পারেন। পণ্ডিত নেহরু স্বয়ং বিংশশতাব্দীতে আমেরিকা আবিষ্কার করে এলেও কংগ্রেস কর্মী সইফুদ্দিন কিচলু ও পণ্ডিত সুন্দরলাল সোভিয়েটের শান্তিনীতির মস্তবড় ব্যাখ্যাকারী ও সমর্থক বলে পরিচিত হতে পারেন। জনসাধারণের চোখে এ জিনিষ একটু অদ্ভুত ও রহস্যজনক মনে হলেও আমাদের দেশের বামপন্থী পার্টিগুলি[র] তরফ থেকে আজ পর্য্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে এমন কিছুই বলা হয়নি যার থে[কে] জনসাধারণ নেহরু সরকারের বৈদেশি[ক] নীতি বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তা[র] নিরপেক্ষতার ভূমিকাকে যথাযথ ভা[বে] বিচার করে এর তাৎপর্য্য বুঝতে স[ক্ষম] হ'ন। অবশ্য উল্টোটাই বেশী হয়েছে—অর্থাৎ, প্রকৃত ঘটনা ও তথ্যের ভিত্তিতে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচারের বদলে স্বস্ব পার্টি লাইনের গোঁড়ামিকে পূর্ণ মাত্রায় বজায় রেখে একপেশে ও উদ্ভট-ভাবে বিষয়টীর অপব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাই জনসাধারণও এতদিন ভুলে অন্ধকারে পথ হাতড়ে বেড়িয়েছেন।

সাম্প্রতিক কালের মধ্যে নেহ[রু] সরকারের দুইটী কাজের প্র[তি] প্রথমতঃ লক্ষ্য করা যাক। প্রথম—ভারত সোভিয়েট বাণিজ্য চুক্তি; দ্বিতীয়—২০ মিলিয়ন ডলারের ভারত মার্কিন অর্থনৈতিক সাহায্য (economic aid) চুক্তি। প্রথমটীকে সকলের সংগে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলাম আমরাও। সোভিয়েটের সংগে যে কোন পুঁজিবাদী দেশের যে কোন চুক্তিকেই আমরা অভিনন্দন জানাই কারণ, সোভিয়েট বর্তমান জগতে শান্তি ও প্রগতির অদ্বিতীয় নেতা। যে যার সংগেই যে কোন রকম চুক্তিই করুক না কেন বিশ্বের সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লবী স্বার্থকে, বিশ্বের শান্তিকে বিন্দুমাত্র ক্ষুন্ন করেও সে তা' করবেনা, ইতিহাস এই কথাই প্রমাণ করে এবং তাতে আ[মরা] বিশ্বাস রাখি। কাজেই ইঙ্গ-সো[ভিয়েট] ফরাসী-সোভিয়েট, ভারত-সো[ভিয়েট] প্রভৃতি যে কোন প্রকার চুক্তিই আমাদের সমর্থন যোগ্য। কিন্তু এ কথা বলার অর্থ কি এই, যে সোভিয়েটের সংগে চুক্তিকারী যে কোন দেশের সরকারের পররাষ্ট্র ও বৈদেশিক নীতিই আমাদের সমর্থন যোগ্য? নিশ্চয় নয়। কারণ আমরা আজ পরিষ্কারভাবে দেখতে পাই যে চীন ও সোভিয়েটের সংগে চুক্তি করা সত্ত্বেও গ্রেট-বৃটেন আজ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মার্কিন-সাম্রাজ্যবাদেরই পরম বন্ধু এবং মালয়, গায়না এবং কেনিয়ার মুক্তিকামী জনগণের বর্ব্বর ও অত্যাচারী শাসক। সুতরাং ভারত-সোভিয়েট বাণিজ্য চুক্তিকে সমর্থন করতে গিয়ে যদি এমন কথা বলতে হয় যার অর্থ, নেহরু সরকার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অনেক মহান কাজ করেছে[ন]

বৈদেশিক

কায় নেহরু সরকারের

এবং ক্রমশঃই প্রগতিশীল ও শান্তিবাদী হয়ে পড়ছেন তাহলে এই রকমই এক গোল বাঁধে। গত ১২-১-৫৪ তারিখে এক সংবাদিক সম্মেলনে ভারতের কমিউনিষ্ট-পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড অজয় ঘোষ বল্লেন, সরকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এমন কতকগুলি 'সুনির্দিষ্ট' কাজ করিয়াছেন যাহার ফলে শান্তির পথ সুগম হইয়াছে ও আন্তর্জাতিক উত্তেজনা হ্রাস পাইয়াছে। সরকারের এইসব কাজকে আমরা অভিনন্দন জানাই।" (যুগান্তর ১৩ই জানুয়ারী '৫৪) একথা যদি সত্য হয় অর্থাৎ নেহরুর আন্তর্জাতিক ভূমিকা শান্তি বিরোধী না হয়ে যদি সত্যই শুভবুদ্ধি প্রণোদিত হয় তাহলে ভারত-মার্কিন অর্থনৈতিক চুক্তিকে ব্যাখ্যা করার উপায় কি? তার উত্তরে তখন হয় নীরব ও নিশ্চুপ থেকে সমস্যাটাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতে হয় না নয় তৎক্ষণাৎ নির্লজ্জভাবে নিজেদেরই গতকালের উক্তির বিরোধিতা করে বিনা যুক্তিতে বিনা বিচারে 'মার্কিন দালাল' কথাটা নেহরুর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে হয়। অবশ্য যাঁরা অনায়াসে এ ধরণের স্ববিরোধী উক্তি করতে পারেন বা বহু দিন ধরে অভ্যাসের ফলে আজ তা যাঁদের চরিত্রগত দোষে পরিণত হয়েছে তাঁদের কাছে এটা নিতান্ত মামুলি ব্যাপার। কিন্তু তার অতি মারাত্মক পরিণাম হল যে জনসাধারণ এই ধরণের স্ববিরোধী, যুক্তিহীন এবং আবোল বোল উক্তির প্রভাবে ক্রমশঃই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন এবং ক্রমশঃই রাজনৈতিক ব্যাপারে উদাসীনতা ও নিশ্চেষ্টতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে বাধ্য হন। তাই এই ধরণের দায়িত্বহীন মন্তব্য এবং মন্তব্যকারী ব্যক্তি বা দল উভয়ের সম্পর্কেই জনসাধারণের যথেষ্ট সাবধান হওয়া দরকার।

নেহরু সরকারের আন্তর্জাতিক ভূমিকা একটা বিশেষ ও নতুন ধরণের ভূমিকা। পৃথিবীর অন্যান্য পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলির সাথে বিশ্বপুঁজিবাদকে টিঁকিয়ে রাখার স্বার্থে তার মূলগতঃ কোন পার্থক্য না থাকলেও ব্যবহারিক পার্থক্যটা যথেষ্ট। নেহরু সরকারের জাতীয় ও পররাষ্ট্র-নীতির বনিয়াদ গড়ে উঠেছে ভারতের স্বদেশী একচেটিয়া পুঁজিবাদের স্বার্থের উপর ভিত্তি ক'রে। আজকের ভারতবর্ষে যাঁরা পুঁজিবাদ ও পুঁজিবাদী-শাসনের অস্তিত্ব দেখতেই পান না তাঁদের কথা অবশ্য আলাদা। কিন্তু যাঁরা ভারতের জাতীয় অর্থনীতিতে ধনতন্ত্রের বিকাশের ইতিহাস জানেন এবং ভারতের পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কমরেড্ ষ্ট্যালিনের বিশ্লেষণকে (তাসখেন্দ বিশ্ববিদ্যালয় বক্তৃতা ১৯২৪) মূল্য দেন তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে বর্ত্তমান ভারতবর্ষে 'প্রগতিশীল জাতীয় বুর্জোয়া' শ্রেণীর অস্তিত্ব আর নেই। কারণ 'জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী'র যে অংশ একদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের নেতৃত্ব ক'রে 'প্রগতিশীল' হিসাবে পরিচিত হ'য়ে উঠেছিল ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের আপোষরফার মাধ্যমে সেই অংশই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে ভারতের রাজনৈতিক শাসনভার লাভ ক'রে একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে বর্ত্তমানে আমাদের উপর কংগ্রেসী 'রামরাজত্ব' করছে। তাই নেহরু সরকার জাতীয় একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থ সংরক্ষণকারী যন্ত্র মাত্র। কাজেই নেহরু সরকারের প্রতিটী চালচলন, জাতীয় ও বৈদেশিক নীতি প্রধানতঃ ভারতবর্ষের বর্ত্তমান পুঁজিপতিদের প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব, আশা আকাংখাকেই প্রকাশ করে।

গত মহাযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের পুঁজিপতিদের একটা আমূল পরিবর্ত্তন ঘটেছে। দেশ যখন বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের অধীনে অত্যাচারে জর্জ্জরিত, দুর্ভিক্ষ মহামারীতে বিপর্য্যস্ত, আমাদের দেশের পুঁজিপতি ও ব্যবসাদারেরা তখন চাল, পাট, কাপড়, মিলিটারী কণ্ট্রাক্ট প্রভৃতি বহু রকমের ব্যবসার মধ্য দিয়ে কোটী কোটী টাকার মুনাফা লুঠেছে। আমরা জানি ব্রিটিশ লগ্নী পুঁজির আওতাতেই ভারতের দুর্ব্বল পুঁজিবাদ একদিন জন্ম নেয়। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে দেখা গেল ভারতের কাছ থেকে ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের ঋণের পরিমান ৩০০ কোটী ষ্টালিং। মহাযুদ্ধের আবর্ত্তে সারা ধনতান্ত্রিক জগৎ যখন বিধ্বস্ত এবং একমাত্র মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া আর সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশের অর্থনীতিই যখন 'যুদ্ধকালীন সংকট' ও অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়ের ফলে ধ্বংসপ্রায় তখন ভারতীয় পুঁজিপতিদের এই ৩০০ কোটী ষ্টার্লিং-এর পাওনা জমা হ'ল কেমন করে তা সত্যিই বিস্ময়কর!

আমেরিকা তার বিশেষ অবস্থানের গুণে যুদ্ধের ধ্বংসলীলার আঁচের বাইরে যুদ্ধের যুগে থাকতে পরে মার্কিণ ব্যবসাদারেরা সমগ্র যুদ্ধরত ইউরোপকে টাকা, অস্ত্রশস্ত্র ও মালমশলা সরবরাহ করে মুনাফা লুটেছিল; কিন্তু ভারতীয় পুজিপতিদের ততখানি শক্তি ও সুযোগ না থাকলেও অন্যায় ভাবে মাল মজুদ ক'রে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে অগাধ মুনাফা করেছে। অর্থাৎ, যুদ্ধের দৌলতে নিশ্চিন্তে মহাজনী করে টাকা করার এই ফন্দী এবং কায়দাটা মার্কিন পুঁজিপতিদের মত ভারতীয় পুঁজিপতিরাও আয়ত্ত করেছে গত যুদ্ধের সময়। তাই দেখি কোন্ সুদূর কোরিয়ায় যুদ্ধ বাধল আর আমাদের দেশে হঠাৎ জিনিষপত্র অগ্নিমূল্য হ'য়ে গেল এবং পরে যখন যুদ্ধ বিরতির খবর বেরুল তখন তাদের দুর্ভাবনার আর সীমা রইল না। কিন্তু তাই ব'লে যদি বলা যায় ভারতীয় পুঁজিপতিরা আজ সরাসরি যুদ্ধ করতে চায় বা যুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে চায়—সে কথাও অত্যন্ত ভুল হবে। কারণ যুদ্ধ করবার 'শক্তি' বা 'প্রয়োজন' কোনটাই আজও তাদের দেখা দেয় নি। 'ভারতীয় পুঁজিপতিদের প্রয়োজন কেবলমাত্র বিনা আয়াসে অগাধ মুনাফা করা!' সে মুনাফা যত কম দায়িত্ব নিয়ে, কম শিল্প গঠনের মাধ্যমে, কম ঝুঁকি নিয়ে করা যায় ততই লাভ। কাজেই তারা চায় সাম্রাজ্যবাদীরা সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যদি যুদ্ধ ক'রে ত' করুক, আমরা কেবল যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম, মালমশলা উৎপাদন ও সরবরাহ ক'রে একচেটিয়া মুনাফা করি। সুতরাং যুদ্ধ না হওয়ার অর্থ ভারতীয় পুঁজিপতিদের ব্যবসার স্বার্থহানি হওয়া; আবার যুদ্ধে তাদের সরাসরি জড়িত হ'য়ে পড়ার অর্থ বিরাট দায়িত্ব ও ঝুঁকি কাঁধে নেওয়া। ভারতীয় পুঁজিপতিদের নিরপেক্ষতা, শান্তিনীতি ও অবস্থাবিশেষে মার্কিন বিরোধিতার ভড়ং সবকিছুরই উৎপত্তি এই মনোভাব থেকে।

কিন্তু মাকিন কর্ত্তারা ভারতীয় পুঁজিপতিদের এই অভিসন্ধিটুকু ধরতে পারেনি—তা' নয়। ভারতবর্ষের পুঁজিপতিরা দুনিয়ার মালিক হোক, এ সদিচ্ছা মাকিন ডলারের কোনদিনই নেই। এবং থাকা সম্ভবও নয়। কারণ তাহ'লে আবার তাদের নিজেদের "একচেটিয়া" ব্যবসার স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়। কাজেই আন্তর্জাতিক একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা অন্যান্য দেশের মত ভারতীয় পুঁজিপতিদেরও এই মনোভাব পছন্দ করেনা। কিন্তু অপছন্দ করেই করেই বা উপায় কি? আজ তাদের সরাসরি 'দমন' বা উচ্ছেদ করা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের ক্ষমতার বাইরে এবং তার প্রধান শত্রু সোভিয়েটের বিরুদ্ধে লড়াইএ এই সমস্ত ক্ষুদে পুঁজিবাদী দেশগুলোকে স্বপক্ষে টানার প্রয়োজনীয়তা এবং দুনিয়া জুড়ে সোভিয়েট বিরোধী যুদ্ধবাদী মনোভাব (war psychology) গড়ে তোলার গরজ খুবই বেশী। অপর পক্ষে এই সমস্ত পুঁজিবাদী দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে অনিবার্য্য গণবিপ্লবের হাত থেকে বাঁচিয়ে ভবিষ্যতে একচেটিয়া মার্কিন ডলারের বশে আনতে হ'লে বর্ত্তমানে এদের রাজনৈতিক স্বাধীনতাটুকু মেনে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। এক কথায় ভারতীয় পুঁজিপতিদের এই ক্ষমতা লালসা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আশংকার কারণ হ'লেও তারা নিজেদের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরেই অর্থাৎ সোভিয়েট-বিরোধী যুদ্ধ অভিযানের উদ্দেশ্যে তাদের বেশী না ঘাঁটিয়ে এবং তাদের সাহায্য কামনাই ক'রে। কিন্তু অপর তরফের অর্থাৎ ভারতীয় পুঁজিপতিদের দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা রকম। ভারতীয় পুঁজিপতিরা জানে অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের ঘাড়ে যুদ্ধের বোঝা চাপিয়ে গত মহাযুদ্ধের সময়ে মার্কিন পুঁজিপতিরা কেমন করে মুনাফা লুটেছিল এবং ভারতবর্ষের দুই-শত বছরের প্রভু ব্রিটিশ পুঁজির দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আজ কেমনভাবে এদেশের বুকে তাদের কায়েমী স্বার্থের গোড়াপত্তন করতে চাইছে। ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ ষ্টার্লিং বনাম মার্কিন ডলারের এই নির্লজ্জ স্বার্থদ্বন্দ্ব ভারতীয় পুঁজিপতিদের নজর এড়ায়নি। 'কাজেই সেই দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা অর্থাৎ দু পক্ষের কাছেই দরকষাকষির (Bargaining) মারফত আর একটু লাভবান হ'বার আকাংখা হওয়া তাদের পক্ষে খুব স্বাভাবিক। মার্কিন ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ উভয়ের বিরুদ্ধেই কিংবা কমনওয়েলথের পক্ষে হ'য়ে মার্কিন পুঁজির বিরুদ্ধে হুমকি, কোন কোন ক্ষেত্রে চীন ও সোভিয়েটের সংগে মিতালীর প্রচেষ্টা, উদারতা ও নিরপেক্ষতার মনোভাব, ভারতীয় পুঁজিপতিদের উপরোক্ত মতলববাজ, স্বার্থকেন্দ্রিক মনোভাবেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কাজেই সোভিয়েটের সংগে বানিজ্য চুক্তি, চীনের সংগে বন্ধুত্ব, পাক-মার্কিন চুক্তি-বিরোধী ফাঁকা

(শেষাংস ৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

তি ও ভূমিকা

কমিউনিষ্ট পার্টির নবতম অবদান

(৩য় পৃষ্ঠায় শেষাংশ)

কার্য্য ক্ষেত্রে তার কোন প্রকার প্রভাব না থাকে তাহলে নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণ করার Tactics এর দোহাই-ই সার হয়ে পরে—বিপ্লবী প্রস্তুতি পিছিয়ে পড়ে। কিন্তু যেহেতু জনতার কাছে আজ কংগ্রেস সম্পর্কে সমস্ত আশা নিঃশেষিত সেই হেতু আজ জনসাধারণ (বিশেষ করে মধ্যবিত্ত জনসাধারণ) এক পাল্টা শক্তি বা দলের কথা চিন্তা করছেন। আর বিপ্লবী সচেতনতার অভাব থাকায় তাঁরা সেই পাল্টা শক্তির যথার্থতা পাল্টা সরকার গঠনেই মেটাতে চাইছেন। ঠিক এই অবস্থায় কংগ্রেসের পরে যদি সর্ব্বভারতীয় দিক থেকে কোন-বামপন্থী দলের প্রশ্ন আসে তাহলে কম্যুনিষ্ট পার্টির কথাই আসে সর্ব্বাগ্রে। আর সেই কম্যুনিষ্ট পার্টিও পাল্টা গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের সুখস্বপ্ন দেখাচ্ছে বলে বিশেষ করে মধ্যবিত্ত জনসাধারণের সমর্থন সেই দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে। কিন্তু এইভাবে চলতে থাকলে অতীতে কংগ্রেসের পেছনে কিছু না বুঝে ছুটে জনতাকে যেমন আজ কড়ায় ক্রান্তিতে তার মাশুল দিতে হচ্ছে ঠিক তেমনই আজও যদি স্রোতে গা ভাসিয়ে শুধুমাত্র কংগ্রেস বিরোধীতাকে সম্বল করে কম্যুনিষ্ট পার্টির এই Slogan এর পেছনে ও সেই একই অসংঘবদ্ধভাবে জমায়েৎ হওয়া যায় এবং তার নেতৃত্বাধীনে চলা যায় তাহলে ভবিষ্যতে এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে বাধ্য। অতএব কম্যুনিষ্ট পার্টির পেছনে এই সমর্থন বিপ্লবের স্বার্থে নয়—নিয়মতান্ত্রিকতার মোহে আচ্ছন্ন জনতার ঠিক মন মত কার্য্যক্রমের পেছনে সমর্থন। আর যতদিন এই নিয়মতান্ত্রিকতার ভূত জনসাধারণের ঘাড় থেকে না যাচ্ছে ততদিন ব্যাপক বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে ওঠাও সম্ভব নয়। আজ সব দিক থেকে যেন এ গণতান্ত্রিক আবহাওয়া সৃষ্টি করার চেষ্টা চলছে। সুতরাং এইভাবে গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের কর্ম্মপন্থাকে বর্ত্তমানে মূল রাজনৈতিক কর্ম্মপন্থা হিসেবে গ্রহণ করায় কম্যুনিষ্ট পার্টি জনতার মোহ তো কাটাচ্ছেই না বরঞ্চ তাকে তীব্রভাবে বাড়িয়ে বিপ্লবী আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। খুব ঢাক ঢোল পিটিয়ে ত্রিবাঙ্কুর কোচিনে সেই কর্ম্মপন্থাকে সফল করার এক তীব্র প্রচেষ্টা চলেছে। হায়দ্রাবাদ, অন্ধ্র, পশ্চিমবাংলা প্রভৃতি স্থানেই সেই একই নিয়মতান্ত্রিক কার্য্যকলাপ অনুসরণ হচ্ছে। কম্যুনিষ্ট পার্টির পত্রিকা, বিবৃতি এবং বিভিন্ন সম্পাদকীয় স্তম্ভে যে কথা ফুটে উঠছে সেটা হচ্ছে এই যে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে কোন কংগ্রেস বিরোধী শক্তি এমনকি প্রজা-সোস্যালিষ্ট পার্টি ইত্যাদির সাথেও মিলে তারা "কোয়ালিশন গভর্ণমেণ্ট" বা তথাকথিত গণতান্ত্রিক সরকার গঠনে বদ্ধ পরিকর। এক্ষেত্রে এই সরকার গঠনের মারফৎ রাষ্ট্রের পরিবর্ত্তনের কথা বাদ দিয়েও যে সমস্ত শক্তির সাথে এই সরকার গঠণের প্রস্তাব করা হয়েছে সেটা শুনলে আশ্চর্য্য হতে হয়। যে প্রজা-সোস্যালিষ্ট পার্টির মূলগত বৈশিষ্টের দিক থেকে কংগ্রেসের সাথে বিন্দুমাত্র পার্থক্য নেই (শুধু কংগ্রেস ক্ষমতায় আসীন এবং প্রজা সোস্যালিষ্ট পার্টি নয়) এবং যাদের কম্যুনিষ্ট পার্টিও বহুবার "ইঙ্গ মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের দালাল" হিসাবে ভূষিত করেছে তাদেরই সাথে কংগ্রেস বিরোধীতার ভিত্তি করে সরকার প্রতিষ্ঠা করলে জনতার কোন্ স্বার্থ রক্ষা হবে সেটা বোঝা দুঃসাধ্য। অবশ্য কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রজা সোস্যালিষ্ট পার্টির সঙ্গে ঐক্য ফ্রণ্ট গড়ার ক্ষেত্রও বর্ত্তমানে প্রশস্ত। প্রজা-সোস্যালিষ্ট বা প্রাক্তন সোস্যালিষ্ট পার্টির মূল কর্ম্মপন্থা বরাবরই ছিল নির্ব্বাচন এবং তারাও এতদিন নির্ব্বাচনের ভেতর দিয়ে সমস্ত সমাধানের আশা দিয়ে এসেছে। আর কম্যুনিষ্ট পার্টিরও বর্ত্তমান নীতি তাই। সুতরাং এ অবস্থায় কংগ্রেস বিরোধীতাকে ভিত্তি করে এই দুই শক্তি পক্ষে আঁতাত গড়া কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়।

আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত যে জনসাধারণ বর্ত্তমানে এই সমস্ত জিনিষ চিন্তা করে সঠিক কর্ম্মপন্থা গ্রহণ না করলে বেশ কিছুদিন এর মরশুম চলবে। কিন্তু যদি এই কর্ম্মপন্থা কখনও কিছু পরিমাণে সফল হয় তাহলে জনতার দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর করতে না পেরে কংগ্রেস যেমন শক্তিহীন হয়ে পড়েছে ঠিক তেমনি এই বহু বিঘোষিত গণতান্ত্রিক সরকারের অধীনে জনতা যখন দেখবে যে এর দ্বারা মূল সমস্যা কিছুই সমাধান হয়নি, যেটা হওয়া সম্ভবপর নয়, তখন এই কর্ম্মপন্থার অসারতা বাস্তব অভিজ্ঞতার মাপকাঠিতে যাচাই হবে। সুতরাং সে অবস্থায় আপশোষ করে কিংবা ভুল স্বীকার করে হয়তো আত্মসন্তুষ্টি হতে পারে কিন্তু তাতে জনস্বার্থ পিছুবে বই এগুবেনা। সুতরাং এখনও সজাগ হবার যথেষ্ট সময় আছে। জনসাধারণের কাছে আমরা এই আবেদনই জানাচ্ছি যে বড় দল এবং গরম গরম কথার জন্য কংগ্রেসের পেছনে ছুটে যে দুর্ভোগ একবার হয়ে গেছে তার থেকে যদি কোন শিক্ষা গ্রহণ করতে হয় তাহলে সেটা হচ্ছে এই যে, আর পূর্ব্বের মত বিচার বিশ্লেষণ না করে শুধু বাইরের চাকচিক্যে ভুলবনা। অতএব এখনই এই প্রশ্নের বিচার করে দেশে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হ'ন সমস্ত প্রকার সংস্কারবাদী বেড়াজালকে ঝেড়ে ফেলুন, এটাই হবে একমাত্র করণীয়। সুতরাং সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের নেতৃত্বে সেই আন্দোলনকে দ্রুত এগিয়ে নেবার সঙ্কল্প গ্রহণ করাই হবে আজ প্রতিটি বিপ্লবীর সঠিক পরিচয়।

শ্রীমতী সুশীতল দাশগুপ্তার

দীপালী সিন্দুর

ব্যবহারে কপালে কাল দাগ পড়ে না,
গুণে ও গন্ধে অতুলনীয়।
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়
কার্য্যালয়—সি-৩/৭, রামগড় কলোনী
গাঙ্গুলী বাগান (কলিকাতা-৩২)

এস, ডি-ও'র কোর্টে—

'খামারে লালঝাণ্ডা তোলার অপরাধে' ভাগচাষীর আবেদন নামঞ্জুর ?

গত ৩০।১২।৫৩ তারিখে জয়নগর থানার (২৪-পরগনার) গুড়গুড়িয়া ইউনিয়নের জনৈক ভাগচাষী আলিপুরে এস, ডি-ও'র নিকট ভাগচাষ বোর্ডের রিসিভার নিয়োগের একটী আদেশ স্থগিতের জন্য আবেদন জানাইলে এস-ডি-ও মহাশয় সরাসরি তাহা নাকচ করিয়া দেন। এস-ডি-ও মহাশয়ের বক্তব্য নাকি এই যে তিনি ২৬।১২।৫৩ তারিখে সুন্দরবনের ঐ অঞ্চলে ভ্রমণ করিতে যান এবং দেখেন যে বর্গাচাষীরা তাহাদের খামারে লাল ঝাণ্ডা উত্তোলন করিয়াছে।

বর্গাদারের পক্ষে হইতে ব্যবহারজীব শ্রীদুর্গাচরণ মুখার্জী আইনের ধারা উদ্ধৃত করিয়া ভাগচাষ বোর্ডের রিসিভার নিয়োগ স্থগিত করার আবেদন জানান। সংবাদে প্রকাশ যে এস-ডি-ও মহাশয় উক্ত আইনের কথায় কর্ণপাত না করিয়া মন্তব্য করেন যে তিনি উক্ত অঞ্চলে বর্গাচাষীদের খামারে লাল ঝাণ্ডা তোলা দেখিয়াছেন।

'সিন্থেটিক মোল্ডার্স' শ্রমিকদের দাবী জয়যুক্ত

বেহালাস্থ সিন্থেটিক মোল্ডার্স কোম্পানীর শ্রমিকদের ইউনিয়ন গঠিত হইবার পর হইতেই কর্তৃপক্ষ কর্মচারীদিগের উপর উৎপীড়ন সুরু করে তাহাদের মনোবল ও ঐক্য ভাঙিবার জন্য, এই সংঙ্গে কয়েকজন শ্রমিককে ছাঁটাই-ও করা হইয়াছিল। কিন্তু ইউনিয়নের নেতৃত্বে দীর্ঘকাল ধরিয়া আন্দোলন করার পর কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের দাবীদাওয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে এবং ছাঁটাই শ্রমিকদের কাজে পুনর্বহাল করিতে বাধ্য হইয়াছে।

উক্ত ইউনিয়নের সভাপতি কমরেড অনিল সেন এবং সেক্রেটারী কমরেড সমীরন মিত্র।

ফুড ডিপার্টমেণ্ট কর্মীদের 'দাবী-ব্যাজ' পরিধান

জানা গেল খাদ্য বিভাগের ছাঁটাই-সম্মুখীন ২০,০০০ কর্মচারী ১৯শে ও ২০শে জানুয়ারী 'দাবী-ব্যাজ' পরিধান করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন এবং সর্বত্র কর্মচারিগণ বিশেষ উৎসাহের সহিত ইহা পালন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন।

'রিক্সা-পুলার্স্ ইউনিয়ন'-এর উদ্যোগে জনসভা

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের নেতৃত্বে কলিকাতা রিক্সাচালকদিগের সংগঠন 'রিক্সাপুলারস ইউনিয়ন অব্ ক্যালকাটা' গঠিত হইয়াছে এবং ইহার পতাকাতলে রিক্সাচালকগণ তাহাদের দাবীদাওয়া লইয়া আন্দোলন সুরু করিয়াছে।

উক্ত ইউনিয়নের উদ্যোগে গত রবিবার হাজরা পার্কে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয় এবং তাহাতে প্রায় এক হাজার রিক্সাচালক যোগদান করে। সভাশেষে তাহারা প্ল্যাগ ফেষ্টুন সহ এক দীর্ঘ শোভাযাত্রা করিয়া দক্ষিণ কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় ও তাহাদের দাবীর সমর্থনে আওয়াজ তুলিয়া পরিভ্রমণ করে ও সমগ্র অঞ্চলে যথেষ্ট উৎসাহ ও জনসমর্থন সৃষ্টি করে। শোভাযাত্রার পর তাহারা রিক্সা মালিকগণের সহিত দেখা করিয়া তাহাদের দাবীদাওয়া সমূহ পেশ করে।

হকার-আন্দোলন সংবাদ

মুখ্যমন্ত্রী সদনে ক'লকাতা হকারদের গণ-ডেপুটেশন

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

কিছুদিন যাবৎ ক'লকাতায় রাস্তার ফুটপাথে ব'সে যারা নামমাত্র পুঁজি নিয়ে ব্যবসা চালিয়ে তাদের পরিবারের জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করছিল, তাদের এই ভয়াবহ বেকারীর যুগে সরকারের ওপর নির্ভর না করে সৎপথে জীবিকা নির্ব্বাহের এই পথ বন্ধ ক'রে দিতে কংগ্রেসী সরকারের পুলিশ উঠে পড়ে লেগেছে। কিন্তু ফুটপাথে বিক্রী বন্ধ করে দিয়ে এই হকারকুলের জন্য বিকল্প কোন জীবিকার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব নিতে সরকার রাজী হয় নি। এই অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর সংগে বারে বারে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেও সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নি। অগত্যা, তাদের সমস্যা সমাধানের বা মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে তা আনার অন্য কোন উপায় না দেখে তারা 'ইউনাইটেড হকার কমিটি'র নেতৃত্বে গত ১০ তারিখ ময়দানে মিটিং করে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ী এক গণ ডেপুটেশন নিয়ে যাওয়া হয়। গণডেপুটেশনের চাপে মুখ্যমন্ত্রী হকার প্রতিনিধিদের সংগে পরদিন তাঁর দপ্তরে দেখা করতে রাজী হন।

পরেরদিন ইউনাইটেড হকার কমিটির চারজন প্রতিনিধি শ্রীউৎপল রায়, শ্রীহরিদাস গোস্বামী, শ্রীজগদীশ সরকার শ্রীরবীন্দ্র গাঙ্গুলি, মুখ্যমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধি মণ্ডলীর অন্যতম দাবী "ফুটে ব'সে বিক্রি করার অধিকার দিতে হবে" এই দাবী সরাসরি প্রত্যাখ্যাত হলে, প্রধান মন্ত্রীর কাছে এই দাবী করা হয় যে ফুটে ব'সে বিক্রি করার অধিকার এই হকারকুল যদি না পায় তবে তাদের জীবিকার অন্য কোন ব্যবস্থা করার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। এর পর প্রতিনিধি মণ্ডলীর কাছে, কর্ণার করে দেওয়া, ঋনের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি কয়েকটী ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি তিনি দেন। প্রতিনিধি মণ্ডলীর আলোচনার সময় পুলিশ কমিশনার ও হেড কোয়ার্টারের ডেপুটি পুলিশ কমিশনারও উপস্থিত ছিলেন। পরবর্ত্তী সব ব্যবস্থা করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী পুলিশ কমিশনারকে নির্দ্দেশ দেন। কিন্তু ইউনাইটেড হকার্স কমিটির কাছে খবর নিয়ে জানা গেল যে এখন পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ করে নি। কিন্তু রাস্তায় ফিরিওয়ালাদের ওপর হামলা, গ্রেপ্তার, ফাইন প্রভৃতি পুলিশ চালিয়ে যাচ্ছে সমান তালে।

ব্যারাকপুর বারাসাত মহকুমা পথিপার্শ্বস্থ ব্যবসায়ী সম্মেলন

(সংবাদদাতা)

পশ্চিম বংগের নিঃস্ব বেকার ও বাস্তহারাদের পুনর্বাসন, জীবিকাসংস্থান প্রভৃতি সমস্যার সমাধানে সরকার তাহার বিন্দুমাত্রও দায়িত্ব পালন ত' করেই নাই, বরং ইহারা স্বীয় প্রচেষ্টায় নিজেদের ক্ষুদ্র সাধ্য নিয়োজিত করিয়া অন্নসংস্থানের আশায় যেটুকু ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অগ্রণী হইয়াছেন তাহাতেও সহায়তা না করিয়া সরকার ও পুলিশ যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে তাঁহাদের সকল প্রয়াস নষ্ট করিতে। ব্যারাকপুর ও বারাসাত মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে পথিপার্শ্বস্থ এই জাতীয় উদ্বাস্তু ও বেকারদের ব্যবসায় প্রয়াসের উপর কংগ্রেসী সরকারের হামলা এই নির্লজ্জ সরকারী নীতির সাক্ষ্য বহন করিয়া চলিয়াছে।

১৯৫০ সাল হইতেই এই পথিপার্শ্বস্থ দোকানদারগণের হয়রানি সুরু হইয়াছে এবং মামলা মোকদ্দমা করিয়া জরিমানা আদায় চলিয়াছে। তবে এই আঘাতকে আরো শক্তিশালী করা হইয়াছে ইংরাজ-সৃষ্ট 'হাইওয়েজ অ্যাক্টের ১৯৫৩ সালের সংশোধিত রূপের সাহায্যে। পূর্বেকার আইনে সর্বোচ্চ এককালীন জরিমানা ১০৲ টাকা এবং রায় জারী হইতে তাহা প্রতিপালন পর্য্যন্ত দৈনিক ১৲ টাকা হারে আদায়ের স্থলে বর্ত্তমান আইনে ২৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা এবং দৈনিক ১০৲ টাকা হারে আদায়ের ব্যবস্থা কার্য্যকরী হইয়াছে। ইহা ছাড়া জমি হইতে উচ্ছেদের জন্য জেল জরিমানা, মালপত্রাদি ক্রোক ইত্যাদি সকল অস্ত্রই ব্যাপকভাবে চালু হইয়াছে। যাহাদের কর্মসংস্থানের দায়িত্ব সরকারের তাহাদেরই সর্বস্ব লুণ্ঠন করিবার এইরূপ নির্লজ্জ ফিকির কংগ্রেস সরকারের পক্ষেই সম্ভব। সুখের বিষয় ইহার বিরুদ্ধে এই অঞ্চলের হকারদের আন্দোলন ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিতেছে। ইতোমধ্যেই তাঁহাদের সম্মিলিত চেষ্টায় পুলিশের একটি আক্রমণও প্রতিহত হইয়াছে। পুলিশী উৎপীড়নের প্রতিবাদে গত ৯ই নভেম্বর দমদমে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। পুনর্বাসন ও পূর্ত্তবিভাগীয় মন্ত্রিদ্বয়ের নিকট প্রতিকারের দাবী জানান হইয়াছে, কিন্তু সরকার এখনও নীরব রহিয়াছে।

গত ২৯শে ডিসেম্বর দমদমে ব্যারাকপুর ও বারাসাত মহকুমা দোকানদারগণের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়; তাহাতে—হকারগণের সংস্থানের পূর্বে উক্ত 'হাইওয়েজ অ্যাক্টে'র প্রয়োগ বন্ধ রাখা, মামলা-মোকদ্দমা প্রত্যাহার, আটক ব্যক্তিদের মুক্তি দান, জরিমানায় ক্ষতিগ্রস্তদের রিলিফ প্রভৃতি দাবী করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

নেহরু সরকারের বৈদেশিক ভূমিকা

(৫ম পৃষ্ঠায় শেষাংশ)

আওয়াজ, কোরিয়ার ক্ষেত্রে মার্কিন নীতির বিরুদ্ধাচরণ,এবং কমনওয়েলথের ও গুনগান করা—কোনটাতে "বিশেষ অসুবিধা হয়না। কিন্তু ভারতীয় পুঁজিপতিরা যতই শক্তি ধরুক বা নিরপেক্ষতার বড়াই করুক না কেন, বর্ত্তমান আন্তর্জাতিক একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থের বাহিরে কার্য্যতঃ তারা যেতে পারে না। কারণ, তা যেতে গেলে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন না করে যাওয়ার উপায় নেই। বর্ত্তমান আন্তর্জাতিক একচেটিয়া পুঁজির নেতা হ'ল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। কাজেই বিরোধ থাকা সত্ত্বেও মুল প্রশ্নগুলিতে ভারতীয় পুঁজিবাদ নিজেদের স্বার্থের খাতিরেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সংগে আপোষ রফা করে চলতে বাধ্য। সুতরাং নিজেদের শ্রেণী অস্তিত্ব ও শোষণ ব্যবস্থাকে কায়েম রাখতে গিয়েই ভারতীয় পুঁজিপতিরা আজ স্বেচ্ছায় মার্কিন একচেটিয়া পুঁজির কাছে আত্মসমর্পন করেছে। টেকনিকাল ও ইকনমিক এইড্, কমিউনিটি প্রোজেক্ট, পাঁচশালা পরিকল্পনা, ভি-ভি-সি ইত্যাদি বাবদ কোটী কোটী টাকার মার্কিণ ঋণ গ্রহণ, মার্কিণ বিশেষজ্ঞ ও যন্ত্রপাতি দিয়ে দেশ ছেয়ে ফেলা সমস্ত সরকারী মহলে মার্কিণ প্রীতি ও ঘনিষ্ঠতাকে সুদৃঢ় করা এবং সর্ব্বোপরি মার্কিণ প্রচার দপ্তরকে স্বদেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে সর্ব্ব প্রকারে বিধ্বস্ত করার ঢালাও অনুমতি দানের মধ্য দিয়ে নেহরু সরকার আজ যে ভাবে দেশকে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের পায়ে বিকিয়ে দিতে চলেছে তার থেকে এই কথাই পরিস্কার হয়ে যায় যে পুঁজিপতিরা আজ মুনাফার লোভে স্বদেশের সংগে জঘন্যতম বিশ্বাস ঘাতকতার পথে পা বাড়িয়েছে।

তবু ভারতবর্ষের বর্ত্তমান পুঁজিবাদী শাসক শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীলতা আজ জাতীয় ক্ষেত্রে যতটা খোলাখুলি প্রকাশ পেয়েছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ততটা আজও পায়নি কিন্তু স্বদেশের ন্যায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এদের নীতি যে নিজেদের শ্রেণী স্বার্থের উপর ভিত্তি ক'রেই গ'ড়ে উঠবে এতে আশ্চর্য্যের কিছু নেই। আর যতই দিন যাচ্ছে ইতিহাসের নিয়মানুসারে পুঁজিবাদের সেই শ্রেণী স্বার্থ ততই প্রতিক্রিয়াশীল ও উগ্র হ'য়ে উঠছে। এই প্রতিক্রিয়াশীল গণস্বার্থ বিরোধী পুঁজিবাদ আজ দেশে দেশে ক্রমশঃই মূলতঃ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ জোটের সঙ্গে আপোষ রফা মারফত স্বদেশের জনগণের সাথে আরও বেশী শত্রুতা করছে। কেবল ভারতের পুঁজিপতিদের ক্ষেত্রেই যে এই আচরণ লক্ষ্য ক'রা যায় তা নয় সারা দুনিয়া জুড়ে আজ সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশ, ঔপনিবেশিক ও আধা ঔপনিবেশিক দেশই আজ স্বেচ্ছায় মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ রফা ক'রে স্বদেশ দ্রোহিতা করছে।

[আগামীবারে সমাপ্য]

পড়ুন

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের হিন্দী মুখপত্র

নয়াযুগ

সম্পাদক—শঙ্কর সিং

মূল্য – এক আনা

প্রাপ্তিস্থান :—"নয়াযুগ" কার্য্যালয়

ঝড়িয়া, মানভূম।

গণদাবী

রেজিঃ নং সি ৩২৫৩

জয়ের পথে সুন্দরবনের গৌরবোজ্জ্বল তেভাগার লড়াই

ভাগচাষী ক্ষেতমজুরের মিলিত সংগ্রামে ভারতের কৃষক আন্দোলনে নূতন অধ্যায় রচিত

[ক্ষেতমজুর ফেডারেশন অফিস হইতে প্রাপ্ত]

সুবিস্তীর্ণ সুন্দরবন অঞ্চল ব্যাপিয়া যে বিপুল তেভাগা সংগ্রামের জোয়ার উঠিয়াছে তাহা আজ জয়ের মুখে। সুন্দরবনের অজ্ঞ কৃষক সম্প্রদায় যাহারা চিরকাল জমিদার-জোতদার মহাজনদের স্বার্থে নিজেদের লোনা রক্ত জল করিয়া আসিতেছে, উঁহাদের বাড়ী গাড়ী ও সহুরে সভ্যতার যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে, তাহারা আজ সংগ্রামের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব বীরত্বের পরিচয় দিয়াছে। নিজেদের ন্যায্য দাবী আদায়ের জন্য আজ তাহাদের মুখের রেখায় সুন্দরবনেরই ব্যাঘ্রের ন্যায় দৃঢ় শপথের ঘোষণা চিহ্নিত। প্রতি পুরুষ, রমনী এমনকি শিশুর মুখেও 'এই ফসলে তেভাগা চাই' ও 'পঞ্চায়েৎ খামার মানতে হবে' এই ধ্বনিতে প্রতি গ্রাম মুখরিত। মুষ্টিমেয় পরগাছা সম্প্রদায় তাই আজ ত্রস্ত, শংকিত; তাহাদের পুরাতন কৃত্রিম দাপট আজ পুলিশী সন্ত্রাসের পিছনে দাঁড়াইয়াও স্তিমিত।

কিন্তু এই সংগ্রাম একদিনে গড়িয়া উঠে নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন লড়াই ব্যাপ্তি লাভ করিয়া বর্ত্তমান বিরাট রূপ লাভ করিয়াছে; সভা, প্রতিবাদ ও কর্তৃপক্ষকে ঘেরাও হইতে সুরু করিয়া, নিজেদের সংগঠিত করিয়া তাহারা আজ প্রত্যক্ষ সংগ্রামে পৌছিয়াছে। দুই বৎসর পূর্ব্বে সরকারের ধান-ধরা নীতি (Procurement policy) যখন এই অঞ্চলে চালু হয় এবং জমিদার-জোতদার-দের নিকট হইতে ধান সংগ্রহ করার পরিবর্তে সাধারণ কৃষক ও ক্ষেত মজুরদের দুই সের ধানকেও রেহাই দেয় নাই, তখনই সাধারণ চাষী এস-ইউ-সি ও ক্ষেতমজুর ফেডারেশনের নেতৃত্বে সংগঠিত হইয়া আন্দোলন করে ও বহু ক্ষেত্রে সরকারী নীতিকে প্রতিহত করে।

ইহার পরে, খাদ্য আন্দোলনের সময় ইহারাই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করে সংযুক্ত দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির আহ্বানে।

বর্তমান লড়াই শুরু হয় কবুলতি আদায়ের প্রতিরোধে—সাদা কাগজে ষ্ট্যাম্পের উপর সই করাইয়া ও তাহাতে ব্যর্থ হইয়া অতঃপর গুণ্ডার সাহায্য লইয়া ভাগচাষীদিগকে উচ্ছেদের চেষ্টা করিলে তাহারা কিরূপ বীরত্বের সহিত লড়িয়া জমি দখল করিয়া চাষ করে, ফসল উৎপন্ন করে, তাহা আজ সুবিদিত।

ইহারই পরবর্তী ধাপ হিসাবে আসে তেভাগা আন্দোলন। বর্গাদার আইনকে অমান্য করিয়া, তাহার ত্রুটীর সুযোগ লইয়া জমিদারচক্র ভাগচাষীদের নায্য প্রাপ্য হইতে তাহাদিগকে ফাঁকি দিবার ষড়যন্ত্র করিলে ভাগচাষীগণ রুখিয়া দাঁড়ায় এবং সংঘবদ্ধভাবে "পঞ্চায়েৎ খামার" গড়িয়া তাহাতে উৎপন্ন ধান কাটিয়া আনিয়া মজুত করে এবং নিজেদের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সাহায্যে তাহা রক্ষা করে। এই সময়ে জমিদারগোষ্ঠীর আক্রমণ নগ্নরূপ ধারণ করে এবং ব্যাপকভাবে সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার, ক্ষেত মজুর ফেডারেশন প্রভৃতির কর্মীদের ও সাধারণ চাষীদের উপর পুলিশের ও গুণ্ডার সাহায্যে সম্মিলিত আক্রমণ চালায়, মিথ্যা মামলা মোকদ্দমা রুজু করিয়া সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে। ইহার প্রতিরোধে আন্দোলন যেমন দ্রুত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে তেমনই তীব্র হইয়া উঠে; জয়নগর ও মথুরাপুর থানা হইতে সুরু করিয়া ক্যানিং, কাকদ্বীপ, কুলপী প্রভৃতি অপরাপর থানাগুলিতেও বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং সমগ্র সুন্দরবন জুড়িয়া এক প্রবল গণ-সংগ্রামের আগুন জ্বলিয়া উঠে। সর্বত্রই চাষীগণ জমি দখল করিয়া চাষ করিয়া উৎপন্ন শস্য কাটিয়া নিজেদের পঞ্চায়েৎ খামারে মজুত করে এবং যৌথপ্রথায় সেগুলি পরিচালনা ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সাহায্যে রক্ষণা-বেক্ষণ করে জমিদার গুণ্ডা পুলিশ চক্রের সকল আক্রমণ ও অত্যাচার প্রতিহত করিয়া, প্রতিটি ঘটনায়, প্রতিটি ধাপে তাহাদের মনোবল ও সংঘশক্তি হইয়াছে দৃঢ়তর এবং সংগ্রাম হইয়াছে তীব্রতর। **আজ তাই ২৪ পরগণায় বিস্তীর্ণ ১ লক্ষ ২০ হাজার বিঘা জমির উপর প্রায় ৫০ হাজার বীর ভাগচাষীর অংশগ্রহণে অর্দ্ধ-সহস্র 'পঞ্চায়েৎ খামার' চালু রহিয়াছে।** প্রতিটি চাষী পরিবারের জনসংখ্যা গড়ে ৫ জন ধরিলে সুন্দরবনের এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে **২ লক্ষাধিক কৃষক আজ এই সংগ্রামে সোজাসুজি সামিল হইয়াছে।** নিশ্চিতরূপে বলা যায় আগামী চৈত্র মাসের মধ্যে উপরিউক্ত পরিমাণগুলি দাঁড়াইবে বর্তমানের দ্বিগুণ।

ভাগচাষ Conciliation বোর্ড গুলিতেও আজ তেভাগা ও পঞ্চায়েৎ খামার সম্পর্কিত মামলা বিচারাধীন আছে প্রায় ৬০০০। এগুলিরও অধিকাংশে বর্গাদারদের জয়ের সংবাদ আসিতেছে এবং ক্রমশঃ আরো অধিক সংখ্যায় আসিবে সুনিশ্চিত।

সরকার-জমিদার জোট মিথ্যা মামলা রুজু করিয়া, হয়রাণি করিয়া সংগ্রামী মনোবল ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছে। আন্দোলন যদিও আজ সফলতার মুখে, তবু এখনও অন্ততঃ ২৫০ জন কর্মীর নামে ৬০০টির বেশী ফৌজদারী ও অন্যান্য মিথ্যা মামলা চলিয়াছে ও তৎসংগে সন্ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টা চলিয়াছে। ইহারই এক সাম্প্রতিক নিদর্শন হিসাবে নিম্নোক্ত ঘটনার উল্লেখ করা যায়। কোন এক মিথ্যা মামলার 'আসামী' ধরার কালে পশ্চিম জটায় কয়েকজন এস-ইউ-সি কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়, এবং তাহার প্রতিবাদে ৪-শতাধিক কৃষক রমণী ও তাহারও অধিক পুরুষ মিছিল করিয়া গিয়া দারোগার নিকট উহাদের মুক্তির দাবী জানায়। কিন্তু পুলিশ বিনা প্ররোচনায় উহাদের আক্রমণ করে ও বন্দুকের কুঁদার সাহায্যে কয়েকজন কৃষক রমণীকে জখম করে। শেষ পর্য্যন্ত জনতার চাপে উক্ত অফিসার আটক ব্যক্তিদিগকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন ও পুলিশের আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কিন্তু পরদিন পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, এস-ডি-ও প্রভৃতি হোমরা-চোমরা কর্তাগণ সহ এক প্রকাণ্ড সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী সেখানে আসিয়া চাষীদিগকে গ্রেপ্তার ও ঘরে ঘরে খানাতল্লাসী করিয়া হয়রানী করে। একইভাবে সর্বত্রই নানাপ্রকারে সন্ত্রাস-সৃষ্টির চেষ্টা চলিতেছে, কিন্তু জনতার মনোবল রহিয়াছে অনমনীয়। প্রত্যহই বিভিন্ন স্থানে জনসভা হইতেছে এবং প্রতিটিতেই বিপুল সংখ্যায় কৃষক সমাবেশ হইতেছে।

এই বিরাট বর্গাদার আন্দোলনে শুধু যে বর্গাচাষীরা সামিল হইয়াছেন তাহা নহে। ক্ষেতমজুর ফেডারেশনের কমিটিগুলির আহ্বানে তেভাগা আন্দোলনের পাশাপাশি ক্ষেতমজুরদের মাহিনা বৃদ্ধি আন্দোলন ও সাথে সাথে এই তেভাগা আন্দোলনের জন্য ক্ষেত্র-বিশেষে বাহির হইতে মজুর আমদানী বন্ধ এই দুই দাবীতে ক্ষেতমজুররাও আন্দোলনের পাশাপাশি দাঁড়াইয়াছেন।

ইহা ছাড়া এই অঞ্চলে উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি বৎসর বিরাট জমির মালিকেরা যে মজুর আমদানী করেন তাঁহাদের নিকট পঞ্চায়েৎ কমিটিগুলি ও ক্ষেতমজুর ফেডারেশনের কমিটিগুলি আবেদন করার ফলে তাঁহারাও এই আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাইয়া জমিদার-জোতদারদের সমস্ত অনুরোধ ও অর্থের প্রলোভন ত্যাগ করিয়া তাদের জন্য এই আন্দোলনের অঞ্চল ছাড়িয়া অন্য স্থানে চলিয়া যান।

এইভাবে শুধু-যে ক্ষেতমজুর ভাইয়েরা আন্দোলনে পূর্ণভাবে সামিল হইয়াছেন তাহা নয়। এ অঞ্চলের মধ্য-চাষীরাও এ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে সমর্থন জানাইয়াছেন। এ আন্দোলন গড়িয়া ওঠার সাথে সাথেই মধ্য-কৃষক ভাইদের এ আন্দোলনের বিরুদ্ধে কাজে লাগানোর জন্য মালিক পক্ষের তরফ হইতে প্রচুর চেষ্টা করা হইয়াছে কিন্তু তাহা ফলবতী হয় নাই। মধ্য কৃষক ভাইয়েদের বহু অংশই এ আন্দোলনকে জয়যুক্ত করার জন্য স্বেচ্ছায় তেভাগা স্বীকার করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, যে সব অল্প জমির মালিকেরা বেওয়া, বিধবা বা বাড়ীতে খাটার কোন লোক নাই তাহাদের জমির উপর তেভাগা আরোপ উক্ত জমির বর্গাদাররা স্বেচ্ছায়ই করেন নাই। এই ভাবে মধ্যবিত্ত-কৃষক বর্গাদার ও একেবারে দিনমজুর প্রত্যেকেই তাঁহাদের সাধারণ শত্রু জমিদার জোতদারদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত আন্দোলনে সামিল হইয়াছেন এবং সেই জন্যই এই সংগ্রাম এত সর্ব্বাত্মক ও দুর্ব্বার হইয়া উঠিয়াছে।

অভূতপূর্ব্ব এই সংগ্রাম আজ জয়-লাভের মুখে। বাংলা তথা ভারতের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে এত বড় বিস্তীর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া দুই লক্ষাধিক কৃষকের এই বিরাট অভ্যুত্থান নিঃসংশয়ে নূতন অধ্যায় রচনা করিয়াছে। জমিদার-সরকার চক্র তাহাদের সকল শক্তি নিয়োগ করিয়া, যথাসাধ্য পুলিশবাহিনীর সমাবেশ করিয়া সংগ্রামী কৃষক শ্রেণীর সহিত শক্তি পরীক্ষা করিয়া আজ হাটিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে। এই আন্দোলন প্রমাণ করিয়াছে যে, সুদৃঢ় সংগ্রামী চেতনা ও সংঘশক্তি, অটুট মনোবল এবং সঠিক নেতৃত্বের নিকট আমলাতান্ত্রিক রাজশক্তি মাথা নত করিতে বাধ্য।

সম্পাদক—প্রীতিশ চন্দ কর্ত্তৃক ২৩, ডিক্সন্ লেন পরিবেষক প্রেসে মুদ্রিত ও ৪৮নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত।